ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-VI, July, 2026, Page No. 2166-2172
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.06W.479

হেমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা: আত্মময় আলো-আঁধার

ড. পীযূষ পোদ্দার, *সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 15.06.2026; Accepted: 22.06.2026; Available online: 31.07.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The question of what poetry is ultimately has stirred and tormented poets and kind-hearted readers throughout the ages. From history, we know that from Jishu to Oppenheimer, poetry has been uttered in deep and troubled moments of life. However, we must also remember that poetry does not mean the poetry of a particular country or a particular time. Reading poetry from a predetermined perspective can give rise to a kind of blindness. As the poet Jeebananda thought, poetry should be revolutionary or uncompromising, or the spokesperson of society and religion etc…, Beyond these statements, we reach the understanding that a voice becomes meaningful, which is inexplicable at the slightest touch. The mysterious reader poet feels this inexplicable magical touch. The depth of reader's feelings is therefore important in understanding poetry.

Keywords: Journey, joyful wonder, door, mysterious, world

কবিতা শেষ পর্যন্ত কী এই প্রশ্নে যুগে-যুগান্তরে আলোড়িত ও তাড়িত হয়েছেন কবি ও সহৃদয় হৃদয় সম্বাদী পাঠক। ইতিহাস থেকে আমরা জেনেছি যিশু থেকে ওপেনহাইমার পর্যন্ত জীবনের গভীর ও গ্রস্ত মুহূর্তে কবিতা উচ্চারণ করেছেন। তবে এটাও আমাদের মনে রাখতে হবে কবিতা বলতে কোন বিশেষ দেশের বিশেষ কালের কাব্যকৃতি বোঝায় না। কোনো পূর্বনির্ধারিত সংস্কার থেকে কবিতা পড়া এক ধরণের অন্ধতার জন্ম দিতে পারে। কবি জীবনানন্দ যেমন ভেবেছিলেন— বিপ্লবী বা নির্বিপ্লবী, কিংবা সমাজ ও ধর্ম ইত্যাদির মুখপাত্র হওয়া উচিত কবিতার অথবা এ-সব জিনিসের দিকে মোটামুটি পিঠ ফিরিয়ে অবচেতনে ও নির্জনে সিদ্ধি লাভ করা উচিত; এ জাতীয় ধারণা থেকে কবিতা পড়তে গেলে অনেক সময়েই কবিতা থেকে দূরে সরে যাই আমরা[১]। কবিতা 'এক রহস্যময় মায়াজাল' কিংবা স্মরণযোগ্যতাই সার্থক কবিতার প্রাথমিক শর্ত— এসব কথন পেরিয়ে আমরা পৌঁছে যাই এই বোধে, একটি কবিতা সার্থক হয়ে ওঠে যে জাদু স্পর্শে তা ব্যাখ্যাতীত। এই ব্যাখ্যাতীত যাদুস্পর্শকে অনুভব করেন মরমী পাঠক-কবি। কবিতা বুঝতে পাঠকের অনুভবের গভীরতা তাই গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সময়েই দেখা যায় কবিতা আর পাঠকের অলিখিত স্মৃতিবীজ বা অভিজ্ঞতা সমপর্যায়ের না হলে অনুশীলন সত্ত্বেও কবিতায় পাঠকের প্রবেশাধিকার ঘটে না। প্রাথমিক অবস্থায় আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে কবিতা রচনার উপাদান হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। কিন্তু মনে রাখতে হবে আমাদের যেকোন অভিজ্ঞতা পরের মুহূর্তেই স্মৃতি হয়ে ওঠে; অভিজ্ঞতাজনিত অনুভূতির স্মৃতি।

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে কবিতা লেখা যায় না। প্রত্যক্ষ লৌকিক অভিজ্ঞতা আমাদের মর্মজাত হয়ে দ্বিতীয় ভুবনের অলৌকিকতায় প্রবেশ করলে কবিতার সৃজন শুরু হয়।

জগৎ-জীবন এক আনন্দময় বিস্ময়ের অভিযাত্রা! বস্তু পৃথিবী আর নিসর্গের দিকে শিশুর কৌতূহলে তাকিয়ে, বোধ আর মনন দিয়ে উপলব্ধি করতে চাইলে এক অপার রহস্যের দরজা খুলে যায়। চেনা পৃথিবী নতুন রূপে ধরা দেয়। যে সুররিয়াল চেতনার কথা পূর্বজ কবিদের কেউ কেউ বলেছিলেন হেমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম কাব্য 'নশ্বর অলীক যাতায়াত'-এর প্রথম কবিতায় সেই মরমী উপলব্ধির গহনতাকে আমরা আবিস্কার করতে পারি— 'একশো বছর পরে আজ/শুশ্রূষা আলয় থেকে/আরকের গন্ধ থেকে/কতিপয় সাদা নার্স, /পথে এসে, মিশে গেল, /বৃষ্টির ফোটায়!' পাঠকেরা এই কবিতা পঙ্‌ক্তিতে স্মরণ করতে পারেন জীবনানন্দ দাশের রাত্রি কবিতার পঙ্‌ক্তিমালা— '...সতত সতর্ক থেকে তবু/কেউ যেন ভয়াবহভাবে পড়ে গেছে জলে/ তিনটি রিক্সা ছুটে মিশে গেল শেষ গ্যাসল্যাম্পে/মায়াবীর মতো জাদুবলে'। দুটি কবিতার প্রেক্ষিত আলাদা। পাঠকের মরমী উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতা কবিতার সমপর্যায়ের হলে এক অদেখা ভুবনে পাঠক প্রবেশ করতে পারেন। একশো বছরের সময়কাল পেরিয়ে আমাদের চেতনা বৃষ্টি স্নাত হলে শুশ্রূষাআলয় আর সাদা নার্স সমার্থক হয়ে রোগ-ক্লেদ-ক্লান্তি পেরিয়ে বৃষ্টিস্নাত হয়।

প্রতিদিনের দিনযাপন, ধুলোবালির ঘরকন্যার মাঝে সংবেদী মানুষের চেতনায় ধুলোমুঠি সোনা হয়ে ধরা দেয়। ক্লান্তি জর্জরিত মানুষ ফিরে আসে স্তনসন্ধিতে, কামনার গাঢ় বাসনাকুসুমে। ঘুম থেকে অন্যবিধ ঘুমে এবং জাগরণ থেকে অন্যবিধ জাগরণে আমাদের চলাচল চলতে থাকে। পাথুরে শিল্প থেকে জেগে উঠে পাথরের মেয়ে আমাদের জানায় 'পাথরের ব্যথাবোধ, পাথরের ভালোবাসা, পাথরের ঘৃণা'। পাঠক সংবেদনশীল না হলে এই উচ্চারণের মধ্যেকার দিব্য অনুভূতি আমাদের কাছে অগম্য থেকে যেতে পারে। ফলের মধ্যে যে কবি নিজের জীবনকে রেখে যেতে চান, তাঁর কবিতা স্পর্শাতুর পাঠকের জন্য অপেক্ষা করে থাকে। যন্ত্র-জীবনের হাজার কলকাকলি ছিন্ন করে হেমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতায় শোনা যায় জলের ছলাৎছল ধ্বনি, তিনি আমাদের হৃদয়পুরে প্রবেশের জন্য ক্রমাগত কড়া নাড়তে থাকেন।

হেমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাসংগ্রহ-তে (আদম পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ) আটটি কাব্যগ্রন্থ আছে। কবিতাগুলির প্রকাশের সময়কাল ধরলে ১৯৮২ থেকে ২০২২ পর্যন্ত চল্লিশ বছরের সময়কালের পটে কবির জগৎ-জীবনের সঙ্গে, সময়-মহাসময়ের সঙ্গে সংঘর্ষসূত্রে যে অভিজ্ঞতা উদ্ভূত হয়েছে; সেই প্রত্যক্ষ লৌকিক অভিজ্ঞতার আবরণ খসে গিয়ে মরমী উপলব্ধির অলৌকিকতায় প্রবেশ করে নির্মাণ করেছে হেমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যভুবন। উপলব্ধির অলৌকিকতার কারণে কবির কবিতাগুলি নির্ভার, মেদহীন, মুক্তাকল্প। আমাদের অনধিগম্যতার কারণে আমরা সাধারণত কবিতার শরীরে সময়ের চিহ্ন খুঁজি, সমাজ-রাজনৈতিক দর্শন খুঁজি কিন্তু অনেক সময়েই এসবের বাইরে জীবন-উপলব্ধির তীব্রতম সংবেদন ধারণ করে, 'কবিতা জননের' প্রতিভায় এক একজন কবি স্বধর্মে স্বরাট হয়ে থাকেন; বিশ্বস্ত থাকেন নিজের প্রতিভার কাছে। সময়ে উপেক্ষিত সেই সকল কবির কাব্য একদিন প্রয়োজন হয়ে পড়ে 'সমস্ত চরাচরের সমস্ত জীবের হৃদয়ে মৃত্যুহীন স্বর্ণগর্ভ ফসলের খেতে বুননের জন্য'[২]। কবি হেমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা বিশ্লেষণে এই সত্য আমাদের উপলব্ধিগোচর হয়।

যন্ত্রণার ক্রুশকাঠ সকল কবিকেই বহন করতে হয়। শুধু সময় ধরে বা সমাজ অর্থনীতি কিংবা রাজনৈতিক মানদণ্ডে কোনো কবির সৃষ্টির বিচার হলে যন্ত্রণার পরিসর আরও বেড়ে যেতে পারে। কবি চেতনার মায়াময় জাগরণকে বুঝতে না পারলে সবই বৃথা। এইসূত্রে আমরা বলতে চাই কবি হেমন্ত

বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা সংগ্রহের আটটি কাব্য ঠিক পোস্টমর্টেমের কবিতার সংকলন নয়। কবি আলোক সরকার যথার্থই বলেছেন,

> "হেমন্তের কবিতাকে কখনো চিরে-চিরে উন্মুক্ত ক'রে দেখতে যেও না, দেখার যা কিছু কবিতা তাকে আড়াল করার জন্যই রচিত হয়। সেই স্পর্শময় উন্মোচন তার প্রতি শ্রদ্ধেয় হও। সে প্রতিমুহূর্তে নিজেকে প্রাঞ্জল করছে, প্রাঞ্জল না করার ধর্ম মেনে নিয়ে।"[৩]

প্রথম কাব্য 'নশ্বর অলীক যাতায়াত'-এর 'রক্তচাঁদ' কবিতাটি এজাতীয় অভিনিবেশ দাবি করে—

ঘুড়ি উড়ছে জ্যোৎস্নায়, সুতো উড়ছে না।
কোনো হাতে সুতো নেই, শুধু
আকাশে-আকাশে, এক হাওয়াকামী ঘুড়ি উড়ছে।
তবু এই জ্যোৎস্নায়, কার যেন রক্ত পড়ে আছে।
অল্প অল্প ক'রে রক্তে মিশেছে ওই চাঁদ
আর, বাতাসে মিশেছে মদ।
শুধু,
আকাশে-আকাশে, এক হাওয়াকামী ঘুড়ি উড়ছে। (রক্তচাঁদ/হেমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় কবিতা সংগ্রহ)

দীক্ষিত পাঠকমাত্রেই জানেন এ কবিতা বাইরের সব অলঙ্কার ছেড়ে অন্তর্মুখী জ্যোতিতে অত্যুজ্জ্বল। এই কাব্যের অসংখ্য স্মরণযোগ্য পঙ্‌ক্তি পেরিয়ে এই কবিতা আত্মসমীক্ষণের বিভায়, ব্যাখ্যাতীত জাদুস্পর্শে সার্থক হয়ে উঠেছে।

বিজ্ঞানের হাতে কলমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা ফলিত প্রয়োগের বিজ্ঞানচেতনার সংজ্ঞা একজন কবির কাছে অসম্পূর্ণ ও নিরর্থক। কবির কাছে বিশেষ জ্ঞানই বিজ্ঞান। দৃষ্টিভঙ্গি, আবেগ-কল্পনা আর সংযমের যথার্থ প্রয়োগই বিজ্ঞান। এই চিন্তন থেকে 'নশ্বর অলীক যাতায়াত' কাব্যের আদিম প্রস্থানে, শূন্য দরজায়, তামাশা, হাওয়া উনুন প্রভৃতি কবিতা পড়া যেতে পারে।

'অসমাপ্ত রূপ' কাব্যের আবহমান, জন্ম কবিতা দুটি প্রাথমিক পাঠে কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও বিনয় মজুমদারকে মনে করিয়ে দিতে পারে। ধ্বনি সাম্যগত মিলের নির্যাসটুকু পেরিয়ে পাঠক এক নতুন উপলব্ধির ভুবনে প্রবেশ করতে পারেন। কবির সঙ্গে আমরাও যেন অনিশ্চিত অন্ধকারে দাঁড়িয়ে, ফুলের বাগানে আগুন লাগা দেখতে পাই; বুঝতে পারি মালির করুণ চোখে যুগপৎ মৃত্যু ও বিবাহ দুলে উঠছে। আসলে চারপাশের দাউ দাউ আগুনে যখন সমকাল পুড়তে থাকে, আমাদের বোবা ও বিক্ষুব্ধ আর্তনাদ থেকে কবি দূরে সরে থাকতে পারেন না। নক্ষত্রখচিত কালো আকাশের নীচে ক্রমশ ফুলের ক্রোধ বা ফুল-সংবেদী মানুষের ক্রোধ ছড়িয়ে পড়ে। আগুনের রূপ একই রকমের হলেও জগৎ-জীবনে আমাদের দগ্ধ হবার মাত্রা ভিন্ন ভিন্ন। যাপিত জীবনে কেবলই চোখের টানে চেয়ে থাকা! কিন্তু উপলব্ধির আলো বহু দিকে যায় বলে আমরা বুঝতে পারি আঁধারের অসমাপ্ত রূপ আলোর আবেগে ক্রমশ পূর্ণতা পায়। একটি পরাচেতনার আলোতে এক মৃদু মেয়ে বিছানায় ফুটে ওঠে; সূর্যোদয়ের আগেই সে চলে যাবে—

সকালের আলো তখনও ফোটেনি। একটি মৃদু মেয়ে
অন্ধকার ভেঙে বিছানায় ফুটে উঠেছে। সে চলে যাবে।
সূর্যোদয়ের আগে।
আকাশে শেষ জ্যোৎস্না। মেয়েটির আঙুলে ব্যথা
এ-সময় টন্‌টন্‌ ক'রে ওঠে।

কিছু পরে, জ্যোৎস্না আর আঙুলের ব্যথা যখন সমান্তরাল'
একটি মোরগ ডেকে ওঠে।
ক্রমে আলোর সঙ্কেত। আলো আসে। (সঙ্কেত/হেমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় কবিতা সংগ্রহ)

এই চেতনাস্তরের সঙ্গে পাঠক সংযোগ সাধন না করতে পারলে অনুশীলন সত্ত্বেও কবিতায় পাঠকের প্রবেশাধিকার ঘটে না। উপলব্ধির সাযুজ্য ব্যতিরেকে সহজ কবিতাও পাঠকের অগম্য থেকে যেতে পারে। কবি হেমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেশিরভাগ কবিতা তাই তীব্রভাবে মনোযোগ দাবি করে। 'রূপ বেশি হলে/গন্ধে ডুবে যায় মাথা' কিংবা 'ভালোবাসি ঘুম / অন্ধকার এসে/ ডেকে নিয়ে যায়' এই কবিতামালায় পাঠক অনুভবের আলোতেই কেবল ভিতরে প্রবেশ করতে পারেন। কবির অভিজ্ঞতা ও কল্পনাকে স্পর্শ করতে পারলেই কবিতার মধ্যে দিয়ে কবির চেতনা সঞ্চারিত হয় পাঠকদের মধ্যে।

ঈশ্বরের বিভা (১৯৮৭), অশ্রুপাবক (১৯৯১) কাব্য দুটির প্রকাশকালের ব্যবধান চার বছরের। ঈশ্বরের বিভা কাব্যে কবিতার কোনো শিরোনাম নেই। সতেরোটি সংখ্যা চিহ্নিত পর্ব মিলে যেন একটাই কবিতা রচিত হয়েছে। জীবনযাপনের বহুবিধ রূপ-রস, কান্না-হাসির দোলদোলানো সাতরঙা আলো ছুঁয়ে আমরা বুঝতে পারি--- 'রূপের বেদনা নিয়ে অপূর্ণাঙ্গ জীবনের রূপ,/ হাঁসের নীরব চোখে ফুটে উঠবে না কোনোদিন'। বেদনার নীলিম কোরককে কেবলই জন্মের আঁধার ঘনিয়ে আসে। সমস্ত রূপের ভাষা অন্ধকারে এক হলেও কখনও আলোর অলীক পাখি এসে মানুষের কাছ থেকে যেন শস্য খেয়ে যায়। মানুষের চোখের আড়ালে; মানুষের সন্তান রূপ পায়, বর্ণ পায়। কবি বারে বারে অন্তর আলোয় স্নাত হবার কথা বলেন, ভিতরের জাগরণের কথা বলেন। এই অন্তর-অবগাহনে কবি হেমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় স্বতন্ত্র হয়ে ওঠেন। তাঁর কবিতার শরীর থেকে ব্যক্তি অভিজ্ঞতা ও লৌকিক অভিজ্ঞতা খসে গিয়ে যেন এক অপার্থিব আলো জ্বলে ওঠে, সৃষ্টি হয় দ্বিতীয় ভুবন। আর এই দ্বিতীয় ভুবনে চোখে দেখা সত্যি-র চেয়ে সত্য হয়ে ওঠে অন্তর-অবগাহনের আলো। রূপের জগৎ পেরিয়ে জেগে ওঠে অপরূপ। অপরূপ আলোর বিভা-ই ঈশ্বর। আর ঐশ্বরিক আলোতে কবি উপলব্ধি করেন— 'জন্মান্ধের চোখে যদি কখনো জ্যোৎস্না নামে/ অন্তরে উদ্ভাস নিয়ে সে কি কুসুমের স্পর্শ পাবে!' পোশাক পরবার মতো সহজ অভ্যাসে জীবনকে বিভিন্ন ভূখণ্ড থেকে দেখে একটি মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপিত করেছেন কবি-

চোখ, যা থেকে উৎসারিত সৌন্দর্যের মৃত্যু হলে,
বাতাসে করুণ অভিনয় চলে।
পাতা কি কখনো বোঝে ফুলের আতঙ্ক?
আশ্চর্য সংশয়ে শুধু সব দিকে সব পাতা দোলে। (হেমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় কবিতা সংগ্রহ)

ফুলের আতঙ্ক পাতা না বুঝলেও, মানব জন্ম ঠিক ফুলের মতো নয়। ফুল ফুরালে কিছু থাকে না, কিন্তু মানুষ ফুরালেও মানুষের আভা থেকে যায় বলে কবি বিশ্বাস করেন। নিরবধিকাল পৃথিবীর আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের পিপাসা থেকে যায়। কবি উপলব্ধি করেন, জীবনের দু'দিকে জ্যোৎস্না আর মাঝখানে শান্ত সমারোহে যেন মৃত্যু ফুটে আছে। অরূপ আলোয় মানুষ নিরন্তর রূপের সাধনা করে যাওয়ার পর বুঝতে পারে আলোই ঈশ্বর। কবি জীবনানন্দীয় অনুভবে বলেন— 'এইসব দেখে-জেনে-বুঝে/সুচিন্তিত একটি ইঁদুর/কী যেন বিশ্বাসে/শূন্য ভাঁড়ারের দিকে গেছে'। আমাদের তীব্র আকুতিকে ব্যর্থ করে স্বেচ্ছাচারী আকাশের নীচে, ভূতলে গড়ায় নিকট স্বজন। পুরোনো পৃথিবী জেগে উঠে মুখ দেখতে চায় মানুষের। আর মানুষেরা দর্পণে দাঁড়িয়ে চণ্ডাল রূপের পরিবর্তে খুঁজে পায় সমাপ্তির ধুলো। আর মানব জীবনের সমাপ্তি তো বাহুল্যহীন—

সমাপ্তিতে শুধু
ফুল প্রয়োজন—
যাতে বাতাস বিখ্যাত হয়। (হেমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় কবিতা সংগ্রহ)

আর আমরা অন্তরে উদ্ভাস নিয়ে কুসুমের পরশ পেতে চাই। অরব আঁধারে আংশিক মুখ জ্যোৎস্নালোকিত হলে, অপর অংশের পোড়াচিহ্ন গোপনে আড়াল করতে চাই । কবির অনুধ্যানে পৃথিবীতে আলোই প্রাণীকুলের আহার; আর সে কারণে কবি মনে করেন আমাদের রক্তের মধ্যে সকল শষ্য ও ফল রূপান্তরিত হয়ে প্রকাশিত হয়।

অশ্রুপাবক কাব্যে কবিতা আছে ছাব্বিশটি। অনন্ত বেদনার মধ্যে আমাদের জীবনযাপন। আমাদের আকাঙ্ক্ষার দুয়ার বারে বারে ঝড়ে ভেঙে পড়ে। এই কাব্যের কবিতাগুলি পড়তে পড়তে আমাদের স্মরণে আসতে পারে ফরাসী কবি-ঔপন্যাসিক ফ্রাঁসিস কারকোর কথা, তিনি বলেছিলেন— কবিতা ধর্মবিশ্বাসের মতো, সে আলোকিত করে শুধু তাদেরি যারা তাতে বিশ্বাসী। এই বিশ্বাস থেকেই নবীন শাড়ির মত আশা জেগে থাকে। কিন্তু নিহত ফলের আকাশ-রাঙানো শোক কিছুতেই মোছানো যায় না। অন্তরের আলোকমালা জ্বলে না উঠলে সবই বৃথা— '...অন্ধ যার/ দু'নয়ন, সে কি আর আভরণ ভুলে/ রূপ দ্যাখে! অন্তরে আলোকমালা যদি/ জ্বালাতে না পারো,তবে, দীর্ণ করে দাও/ ওই সোনালী ফাঁস। অশ্রুর আগুনে আমি/দেখি মুখ মৃত সন্তানের। নষ্ট খোসা/স্তব্ধ নীল বেদনায় বাতাসে উড়ুক'। প্রকৃত প্রস্তাবে পৃথিবীকে কবির অনুভূতির আলো মনে হয়। সেজন্য পৃথিবীতে মানুষের গান পুরোনো হলেও, পাখিদের গান মলিন হয় না। আমাদের প্রতিনিয়ত ভগ্নাংশের দিকে চেয়ে পূর্ণতার খোঁজ করতে হয়। আর কবি ডালে-ডালে, পাতায়-পাতায়, যে-আলো জ্বলেও নিভে যায় তাতে নতুন মাত্রা এনে অসম্পূর্ণ ফুল আর ঈশ্বর ফুটিয়ে তোলেন; রক্তের মাঝে গোধূলির আলো উপলব্ধি করেন। ব্যপ্ত নাস্তির মধ্যে তিনি দেখতে পান—শিশুর হাসিতে গোলাপ ফোটে, শিশুর হাসিতে আকাশ মেশে। আমাদের সমস্ত বেদনা শেষ পর্যন্ত আনন্দকুসুম হয়ে ঝরুক এটা কবির আকাঙ্ক্ষা—

মাটি আমাকে আবার ফিরিয়ে নিয়েছে।
জল আমাকে আবার ফিরিয়ে নিয়েছে।

সহজ পাতার মতো আমি তাই,
ফুটে উঠেছি আবার।

দেখি, সকল বেদনা আজ, তোমার আলোকপথে—
আনন্দকুসুম হয়ে ঝরে।

(হেমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় কবিতা সংগ্রহ)

১৯৯৭-২০২২ এই সময়সীমায় কবির চারটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে— নীলিমাপূরণ (১৯৯৭), আলোকপ্রতিমা (২০১২), নক্ষত্রবীথিকা (২০১৮), অনশ্বর ভিক্ষাপাত্র (২০২২)। শব্দহীনতার ভাষায় প্রকৃতিকে বুঝতে গিয়ে বোঝা যায় প্রকৃতিতে গোলাপ আপন ধর্মে প্রচারিত এবং তার সৌরভ আপন ধর্মে প্রসারিত হয়। হেমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতায় আলো ও অন্ধকার শব্দ দুটি বারে বারে ফিরে আসে। রবীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠিতে জীবনানন্দ লিখেছিলেন— 'বিভিন্ন রকম বেষ্টনীর মধ্যে এসে মানুষের মনে নানা সময় নানারকম moods খেলা করে'। প্রকৃতপক্ষে আলো-অন্ধকারের সহবস্থানে জীবন প্রকাশিত হয়। প্রকৃতি ও জীবনে নানা সময়ে বিরোধ দেখা দেয়। আধুনিক যুগ যন্ত্রণার জটিল আবর্তে বোধ ও মনন বার বার আচ্ছন্ন হয়। মহৎ কবি এই আচ্ছন্নতা ছিন্ন করে শোনাতে পারেন জীবনের জয়গান। কবি হেমন্ত বন্দ্যোপাধ্যের কবিতায়

অন্ধকার যেন আলোর মত বিচ্ছুরিত হয়। আলো ও অন্ধকার কবির চেতনায় একে অন্যের পরিপূরক হয়ে দেখা দেয়। নীলিমাপূরণ কাব্যের প্রায় প্রতিটি কবিতায় কোনো না কোনো সূত্রে আলো-অন্ধকারের কথা এসেছে। আলো বা অন্ধকারের এই ব্যবহার সূত্রায়িত করলে কবির জীবনবোধ কেন্দ্রিক চেতনাকে আমরা স্পর্শ করতে পারি—

১। মুকুরে প্রতিফলিত আলো কখনো কি
ফিরে পাবে প্রকৃত আলোর অভিজ্ঞান? (ধর্ম/ হেমন্ত বন্দ্যোপাধায় কবিতা সংগ্রহ)

২। আমার শিশুর প্রশ্ন: আকাশের এত আলো
অন্ধকারের ভাষায় কোথায় হারালো!
আমার শিশুর প্রশ্ন: অমেয় রাত্রির পারে—
তমোঘ্ন কীভাবে জাগে আশ্চর্য আধারে! (প্রশ্ন/হেমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় কবিতা সংগ্রহ)

৩। লিখেছি তোমার নাম আকাশে-আকাশে;
যদি ঢাকা পড়ে যায়, যদি মেঘ এসে
আড়াল রচনা করে আধার-অক্ষরে, (অশ্রুলিখন/হেমন্ত বন্দ্যোপাধায় কবিতা সংগ্রহ)

৪। লিখে যাই রাত্রির কবিতা:
দিবালোকে নয়, পাঠ ক'রো অন্ধকারে।
যদি আমাকে প্রশ্নার্ত করো,
যদি বলো, 'কীভাবে সম্ভব?'
আমার রচিত—ব্যথাবোধ,
আমার রচিত—একাকী ঈশ্বর,
আমার রচিত—আঁধার-অক্ষর,
দ্যাখো, আলোরেখা হয়ে, তোমার উওর। (উওর/হেমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় কবিতা সংগ্রহ)

৫। অরব অক্ষরমালা হয়ে
অন্ধকারে একাকী ঈশ্বর,
প্রতীক্ষায় পড়েছে ঘুমায়ে। (প্রত্যাশা/ হেমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় কবিতা সংগ্রহ)

৬। আলো বা হাওয়ায় নয়,
বর্ষণমুখর অন্ধকারে—
সেই গান নিঃশব্দে বাজে
বিষণ্ণতার ওপারে। (বর্ষণমুখর/হেমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় কবিতা সংগ্রহ)[৪]

উদাহরণগুলিতে আমরা বুঝতে পারি মনন ও চিন্তার অনুশীলনে কবি চিন্তার দাহ্যতায় শূন্যে মিশে গিয়ে আলো-অন্ধকারের পথযাত্রী হতে চান। কিন্তু মনে রাখতে হবে কবি হেমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় সৃজনে কোনো একবজ্ঞা ধারনায় বিশ্বাস করেন না। তিনি আলোর প্রকৃতি যেমন বুঝতে চেয়েছেন তেমনি আস্বাদন করতে চেয়েছেন তমসার মহিমা। খুব অল্প শব্দে কবি ভাবপ্রতিমা গড়ে তোলেন। ইন্দ্রিয়ের উল্লম্ফন বা লিবিডোর টানাপোড়েন তাঁর কবিতায় খুব একটা প্রত্যক্ষ হয় না। বরং জীবনজুড়ে সত্য-শিব-সুন্দরের যে উপলব্ধি তা-ই তাঁর কবিতার প্রধান চালিকা শক্তি। অন্ধকারে একাকী ঈশ্বরের প্রতীক্ষা কিংবা বিষণ্ণতার ভিতরে গান বেজে ওঠা, প্রেমকে পরম রূপে উপলব্ধি করাই কবির কাঙ্খিত। এই উদারণগুলি ছাড়াও অনিঃশেষ, বিনশ্বর,

আবহমান, প্রকাশ, নৈশ অন্তরাল প্রভৃতি কবিতায় আলো ও আঁধারের প্রয়োগে জীবনকেই প্রকাশ করেছেন কবি।

নীলিমাপূরণ কাব্যের পরবর্তী কাব্যের নাম আলোকপ্রতিমা। আমরা দেখতে পাই এই কাব্যের বিভিন্ন কবিতায় প্রেম আর অপ্রেম, হর্ষ আর বিষাদ, আলো আর অন্ধকার যেন পাশাপাশি বিরাজ করছে। আসলে আমরা বিপ্রতীপ বিষয়ের মধ্যে দিয়ে জীবনকে বুঝতে পারি— রমণীর জ্বালানো সন্ধ্যাপ্রদীপে সন্ধ্যাও রমণীয় হয়ে ওঠে আর সেই আলোর বিপরীতে মূর্ত হয়ে ওঠে তার আঁধারজড়ানো সংসার। অন্ধকার আনত আলোকে পূর্ণ করে অধরা চুম্বনে। কবির কাছে তুলসীপ্রদীপের আলোর বিভা হয়ে ওঠে অন্ধকারের প্রবেশপথ। রমণীর আলোতে সন্ধ্যা রমণীয়। অন্ধকারকে জাগায় তুলসীতলার আলো। আলোর অন্ধকারে নশ্বর ইশ্বর হয়ে ফুটে ওঠে। আঁধারের পরিপূর্ণ রূপকে বোঝবার জন্য তার পেছনে আলো ফেলা প্রয়োজন। আমরা বুঝতে পারি কবি অন্ধকার শব্দটিকে দ্বৈত সত্তারূপে বুঝেছেন। অন্ধকার দ্বিখণ্ডিত হয়ে জন্মলগ্নের কথা বলে, আবার সেই অন্ধকার একাকীর দ্বি=সত্তার রূপকে চিনিয়ে দেয়; বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সৃষ্টিরহস্যের উন্মোচন ঘটায়। নক্ষত্রবীথিকা কাব্যে অনন্তের সাদা পথে আশ্চর্য রথ এসে থামে! অসীমের ধুলোর মহিমা আঁখিযুগলের বন্দনাসংগীত হয়ে বেজে ওঠে। ঘর পরিস্কার করবার ছলে আমরা যেন প্রতিদিন ধুলো সংগ্রহ করি। অনন্তের পথে-পথে একাকী ভ্রমণে অর্গল খুলে বিভা এসে পড়ে। অন্ধকার খুলে ধরে কবি আলোর গভীরে প্রবেশ করেন। মনন-দুয়ার খুলে কবি পথে পথে বিতত হাওয়ার প্লুত প্রস্বর বুঝতে পারেন। মায়ের মুখের লুপ্ত মাধুরী অনন্তের মর্মের রঙ হয়ে ফুটে ওঠে। নীরবতার নীরব নম্র-নত-নীল নমস্কারে তুলসীতলার অন্ধকারে জ্বলে ওঠে দীপ। আর নশ্বর ভিক্ষাপাত্র কাব্যে কবি উপলব্ধি করেছেন পৃথিবীর প্রতিটি পল্লবিত গাছে গাছে অখণ্ডের মাঝে অনন্ত ফুটে আছে। আলোময় প্রশ্নের তিমির ঘিরে আছে আমাদের চারপাশ। নিজের ঐশ্বর্য নিয়ে ফুল ভাবে না, সে কেবল ফুটে থাকে নিঃশব্দ ফোটার আনন্দে। আমরা শুধু চঞ্চল হয়ে উঠি। কবি শেষ পর্যন্ত মরমী উপলব্ধিতে পৌঁছে বুঝতে পারেন—‘পৃথবী আসলে এক কবিতার বই’, নিত্যদিন যাকে আমরা পাঠ করে চলি[৫]। তাঁর কবিতায় অশ্রু আনন্দকে চেয়ে বাতাসে গড়ায়, আনন্দ অশ্রুকে পেয়ে আগুনে জড়ায়!

তথ্যসূত্র:

১. দাশ জীবনানন্দ। কবিতার কথা। সিগনেট প্রেস, ২০১৮, কলকাতা, পৃ. ৬৪-৬৫।
২. তদেব, পৃ. ১০।
৩. বন্দ্যোপাধ্য্ হেমন্ত। কবিতা সংগ্রহ। আদম, ২০২৩, কলকাতা, পৃ. ১।
৪. তদেব, পৃ. ১৫-৬৬।
৫. সরকার, অসীম (সম্পাদনা)। ধানদূর্বা-হেমন্ত বন্দ্যোপাধায় সংখ্যা। ২০২৪, শান্তিপুর, পৃ. ১৮১।